বন্দে মাতরম্

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

চিকিৎসক, গবেষক ও সাহিত্যিক

একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন (বি.বি.সি.) সারা বিশ্বজুড়ে এক জনমত সমীক্ষা চালায় যে, পৃথিবীর জনপ্রিয়তম গান কোনটি? তার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হলে গোটা দুনিয়াই অবাক মানে। দেখা যায়, আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে বিপুলভাবে ছড়িয়ে পড়া বহু সমাদৃত গানকে পেছনে ফেলে প্রথম দুই স্থান অধিকার করেছে যে-দুটি সংগীত, তাদের মধ্যে আশ্চর্য কিছু সাদৃশ্য আছে।

দুটি গানই উনিশ শতকের; দুটিই প্রবল দেশপ্রেম-জাত; দুটিকেই দীর্ঘ সময় ধরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

সর্বোচ্চ সমর্থন পেয়ে সেরার শিরোপা পেয়েছিল আয়ারল্যান্ডকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখানো আইরিশ প্রজাতন্ত্রের ব্যালাড 'আ নেশন ওয়ান্স এগেইন' (১৮৪৪)। আর সামান্য কিছু ভোট কম পেয়ে এই গ্রহের দ্বিতীয় জনপ্রিয়তম সংগীতের সম্মান পেয়েছিল আমাদের ভারতবর্ষের, আমাদের বাংলার 'বন্দে মাতরম্' [ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ২২ ডিসেম্বর ২০০২]—শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেছিলেন, 'পুনরুজ্জীবনের মন্ত্র যা গড়ে তুলছে নূতন ভারত'; রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছিলেন, 'স্বদেশী আত্মা'; যে-গান গেয়ে মুক্তির মন্দির সোপানতলে কত তাজা প্রাণ নিজেকে উৎসর্গ করেছিল; যে-গান গোটা ভারত উপমহাদেশে অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসকের রক্তচক্ষুকে অবজ্ঞা করার স্পর্ধা জুগিয়েছিল।

কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়ে এখানে থেমে গেলে চলবে না। কারণ,

এই গানের বিরুদ্ধে উঠেছে গুরুতর অভিযোগ। একদেশদর্শী নানা বিরূপ সমালোচনা তার পবিত্র শক্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, দেশের নেতৃত্ব তাকে উপযুক্ত স্বীকৃতি জানাতে দ্বিধা বোধ করেছেন। এই গানের জীবন-ইতিহাসে প্রবল জোয়ারের পর এসেছে আচম্বিত ভাঁটা।

আসুন, আমরা সেই ঘটনা-প্রবাহ ফিরে ফিরে দেখি—যথাসম্ভব কালানুক্রমে, যথাসম্ভব নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাস চেতনায়।

সৃজনকাল

সবাই জানি, 'বন্দে মাতরম্' গানটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত। এক জ্যোৎস্নাধোয়া রাত্রে নির্জন বনের মাঝে ভবানন্দের কণ্ঠে এক কলি গান শুনে মহেন্দ্র কৌতূহলী হলেন, সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা মাতা কে?

উত্তর না দিয়ে ভবানন্দ গেয়ে চলল, 'শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্...।'

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার চৈত্র ১২৮৭ সংখ্যা থেকে 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হতে শুরু করে। সেই প্রথম কিস্তির অংশ হিসেবে ওই সংখ্যাতেই 'বন্দে মাতরম্' মুদ্রিত হয়। কিন্তু এটি যে উপন্যাস রচনার আগে পৃথক গান হিসেবে লেখা হয়েছিল সে-বিষয়ে গবেষকরা নিশ্চিত।

কত আগে?

গবেষকরা কিছু তথ্য এবং যুক্তিনির্ভর অনুমান মিলিয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, গানটি রচিত হয়েছিল ১৮৭২ থেকে ১৮৭৫ সালের মধ্যে।

প্রথমত, খেয়াল করা যাক গানের তৃতীয় অনুচ্ছেদের দুটি পংক্তি: 'সপ্তকোটীকণ্ঠ-কলকলনিনাদকরালে/ দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখর-করবালে...'—বলা হচ্ছে, সাত কোটি কণ্ঠের কথা, সাত কোটি জোড়া হাতের কথা—অর্থাৎ, দেশমাতৃকার সাত কোটি সন্তান। কোথা থেকে এই হিসেব পেলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র? ব্রিটিশ ভারতে প্রথম পরীক্ষামূলক আদমসুমারি হয়েছিল ১৮৭১-৭২ সালে। তার রিপোর্টের ভিত্তিতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন', মার্চ-এপ্রিল ১৮৭২ সংখ্যায় 'বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা' শীর্ষক এক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেখান থেকেই উদ্ধৃত করি, "বঙ্গীয় লোকসংখ্যার এই প্রথম প্রকৃত গণনা। ইহাতে স্থির হইয়াছে যে বঙ্গদেশের লেপ্টেনান্ট গভর্নরের শাসনাধীনে যে প্রদেশ [আজকের হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, অসম এবং বাংলাদেশ], তাহাতে ৬,৬৮,৫৮,৬,৫৬ বা ছয় কোটি আটষট্টি লক্ষ আটান্ন হাজার ছয়শো ছাপান্ন জন লোক বসতি করে। প্রায় সাত কোটি।" সুতরাং ১৮৭২-এর আগে 'সপ্তকোটি'-র ধারণাটি ওঠার কথা নয়, আর তাই এই গান ১৮৭২-র আগে রচনা করাও সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় যুক্তি, 'বন্দে মাতরম্'-এ দেশমাতৃকাকে দশভুজা মাতৃমূর্তি হিসেবে কল্পনা করে যে-বর্ণনা (ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী), তার সঙ্গে কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসব'-এ সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমার বর্ণনা প্রায় হুবহু এক। ছদ্মনামে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের এই রচনাটি প্রকাশিত হয় বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১২৮১ সংখ্যায়—মানে, ১৮৭৪ সালের অক্টোবরে। তাই এই রচনার পর পরই 'বন্দে মাতরম্' রচিত হল, এমন অনুমান করা যেতেই পারে।

রচনাকাল ১৮৭২-৭৫ ধারণা করার আর মাত্র একটি যুক্তির কথাই বলি। 'বন্দে মাতরম্'

পত্রিকার ১৬ এপ্রিল ১৯০৭ সংখ্যায় শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বহু আলোচিত 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধের শেষ পর্বে লেখেন, ''বত্রিশ বছর আগে বঙ্কিম তাঁর মহা সংগীত রচনা করেন... 'বন্দে মাতরম্'।'' অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দ সুনির্দিষ্টভাবে বলছেন, এই গান ১৮৭৫ সালে রচিত।

কেউ কেউ মনে করেন, 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' (১৭৭১)-এর বিদ্রোহীরা যে 'ওঁ বন্দে মাতরম্' ধ্বনি ব্যবহার করতেন, বঙ্কিমচন্দ্র তার দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়ে এই গানটি রচনা করেন। কিন্তু ঐতিহাসিক মহলে এই ধারণাটি বিশেষ সমর্থন পায় না। নানা মত বিচার করে গবেষক জগদীশ ভট্টাচার্য তাঁর 'বন্দে মাতরম্' গ্রন্থে এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত টেনেছেন, " '...ওঁ বন্দে মাতরম্' আরাব আর বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃমন্ত্র 'বন্দে মাতরম্'-এর মধ্যে চেতনার দুস্তর ব্যবধান। ওঁ-ধ্বনি বর্জনের ফলে 'বন্দে মাতরম্' দেবলোকের সম্পর্ক মুক্ত হয়ে মর্ত্যলোকের প্রাণমন্ত্র হয়ে উঠেছে।"

'আনন্দমঠ' উপন্যাস রচনার কয়েক বছর আগেই 'বন্দে মাতরম্' গানটি রচিত হয়, সেকথা না হয় প্রতিষ্ঠিত হল; কিন্তু পৃথক গান হিসেবে এটি কি কোথাও মুদ্রিত হয়েছিল? সেই প্রশ্নেও গবেষকরা বিভ্রান্ত।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাই পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ এই প্রসঙ্গে মূল্যবান, "বঙ্গদর্শনে মধ্যে মধ্যে দুই-এক পাতা matter কম পড়িলে পণ্ডিত মহাশয় [পত্রিকা দপ্তরের কর্মী রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়] আসিয়া সম্পাদককে জানাইতেন। তিনি তাহা ঐ দিনেই লিখিয়া দিতেন।... বন্দে মাতরম্ গীতটি রচিত হইবার কিছু দিবস পরে পণ্ডিত মহাশয় আসিয়া জানাইলেন, প্রায় এক পাতা matter কম পড়িয়াছে। সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, 'আচ্ছা আজই পাবে।' একখানা কাগজ টেবিলে পড়িয়াছিল, পণ্ডিত মহাশয়ের উহার প্রতি নজর পড়িয়াছিল, বোধ হয় উহা পাঠও করিয়াছিলেন, কাগজখানিতে বন্দে মাতরম্ গীতটি লেখা ছিল। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, 'বিলম্বে কাজ বন্ধ থাকিবে, এই যে গীতটি লেখা আছে—উহা মন্দ নয় ত—এ'টা দিন না কেন।' সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বিরক্ত হইয়া কাগজখানি টেবিলের দেরাজের ভিতর রাখিয়া বলিলেন, 'উহা ভাল কি মন্দ, এখন তুমি বুঝিতে পারিবে না, কিছুকাল পরে উহা বুঝিবে—আমি তখন জীবিত না থাকিবারই সম্ভব, তুমি থাকিতে পার।' "

গানটির দেরাজ থেকে বেরিয়ে ছাপাখানায় যাওয়ার কোনও প্রমাণ নেই। কিন্তু অমলেশ ভট্টাচার্য প্রমুখ কিছু গবেষক বিশ্বাস করেন ১৮৭৫ সালে 'বঙ্গদর্শন'-এর কোনও সংখ্যায় স্থানপূরক হিসেবে 'বন্দে মাতরম্' প্রকাশিত হয়।

অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্তের বই 'বঙ্কিমচন্দ্র' অনুসারে, হুগলির ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' লেখায় হাত দেন, তখন আর এক ডেপুটি, সংগীতরসিক ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় সন্ধ্যেবেলা বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানায় এসে বড় হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে মল্লারের তানে 'বন্দে মাতরম্' বেঁধে তুলতেন।

তাহলে কি ক্ষেত্রনাথকে এই গানের প্রথম সুরকার বলা হবে? বোধহয় না। অধিকাংশ সূত্র দাবি করছে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্নেহধন্য, ঠাকুরবাড়ির গৃহশিক্ষক, বিশিষ্ট ধ্রুপদি সংগীতজ্ঞ যদুভট্ট (যদুনাথ ভট্টাচার্য) প্রথম এই গানে সুরারোপ করেন। ক্ষেত্রনাথ হয়তো সেই সুরের আদলেই প্রাণের খুশিতে গানটি গাইতেন, কারণ যদুভট্ট মল্লার রাগেই গানটি বেঁধেছিলেন। পরে

রবীন্দ্রনাথ 'দেশ' রাগে 'বন্দে মাতরম্' সুরারোপ করে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রকে গেয়ে শুনিয়েছিলেন। 'মল্লার' এবং 'দেশ' রাগের সুরের চলনে মিল থাকায় অনেকে মনে করেন, রবীন্দ্রনাথ যদুভট্টের সুর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

সুতরাং, 'আনন্দমঠ' প্রকাশের আগে 'বন্দে মাতরম্' সংগীত হিসেবে বেশ কিছু মানুষ শুনেছিলেন। কিন্তু প্রথমদিকে গানটির সাহিত্যমূল্য নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। নবীনচন্দ্র সেনের মতো বিশিষ্ট কবি বঙ্কিমচন্দ্রকে সরাসরি বলেছিলেন, ''দেখ, একটা ভাল জিনিস, কিন্তু আধা-সংস্কৃত আর আধা-বাংলায় লিখে জগাখিচুড়ি করে সব মাটি হয়ে গেল।'' হতাশ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আর এক বন্ধু কালীপ্রসন্ন ঘোষকে চিঠি লিখেছিলেন: ''আমি বা আনন্দমঠ লিখিয়া কি করিব আর আপনি বা তাহার মূলমন্ত্র বুঝাইয়া কি করিবেন? এ ঈর্ষাপরবশ আত্মোদরপরায়ণ জাতির উন্নতি নাই। বল, 'বন্দে উদরং'।'' কিন্তু জীবনের শেষপর্বে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আত্মবিশ্বাস ফিরে পান। মৃত্যুশয্যায় তিনি কন্যাকে বলেছিলেন, ''একদিন তোরা দেখে নিস, আজ থেকে বিশ-ত্রিশ বছর পরে, এই 'বন্দে মাতরম্' গান সারা দেশের মানুষের বুকের রক্তে নাচন আনবে।''

কবিরা দূরদ্রষ্টা হন। তার প্রমাণ মিলল, 'বিশ-ত্রিশ বছর পরে'-ও নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর (৮ এপ্রিল ১৮৯৪) এক যুগের মধ্যেই; গান রচনার প্রায় ত্রিশ বছরের মাথায়। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে।

যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে?

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আগে থেকেই 'বন্দে মাতরম্' বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সামনে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। ১৮৮৬ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে এই গানের কথা শোনা গেল কিছুটা অপ্রত্যক্ষভাবে। বিশিষ্ট কবি হেমচন্দ্র তাঁর যে 'রাখিবন্ধন' কবিতা পেশ করেন, সেখানে বলা হচ্ছে, ''কি আনন্দ আজি ভারত-ভুবনে--/ ভারতজননী জাগিল।/... প্রণয়-বিহ্বলে ধরে গলে গলে/ গাহিল সকলে মধুর কাকলে/ গাহিল—'বন্দে মাতরং। সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং...'।"

এর দশ বছর পর সরাসরি 'বন্দে মাতরম্' সংগীতটিই শোনা গেল ১৮৯৬ সালের কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে। গাইলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। শোনালেন সমাগত বিপুল জনতাকে। শ্রোতৃমণ্ডলী গান ও গায়কীর প্রশংসা করলেন বটে, কিন্তু জাতির প্রাণে ঢেউ তোলার কোনও লক্ষণ তখনও দেখা গেল না।

তার জন্য অপেক্ষা করতে হল বড়লাট লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব পেশ অবধি। সেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সভা ডাকা হল টাউন হলে ৭ আগস্ট ১৯০৫। কলেজ স্কোয়ারে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-যুবা সমবেত হয়ে শোভাযাত্রা করে চলল সভাস্থলে। আর সেই শোভাযাত্রায় আকাশ সচকিত করে বারবার ধ্বনি উঠল 'বন্দে মাতরম্'। সেদিনের সভাতেও গাওয়া হল সেই গান। কিন্তু মিছিলে এই অভিজাত, মননশীল, সংস্কৃত মন্ত্রটিকে শ্লোগান হিসেবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা কার? কেমন করে এত স্বতঃস্ফূর্ততায় এই শ্লোগানে গলা মেলাল হাজার হাজার অল্পবয়সি?

এর কোনও স্পষ্ট উত্তর নেই। শুধু জানা আছে, ওই দিন ওই সময়েই জন্ম দিল সারা দেশকে

জাগিয়ে-তোলা এক মন্ত্র। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, ‘‘... এক নিয়তি-নির্দিষ্ট মুহূর্তে কেউ একজন গেয়ে উঠেছিলেন ‘বন্দে মাতরম্’। মন্ত্র দান হল আর একদিনেই a whole people had been converted to the religion of patriotism.’’ ‘বন্দে মাতরম্’ অবিভক্ত বাংলার দেশপ্রেমিকদের মনে আগুন জ্বালিয়ে দিল। ভয় পেল ব্রিটিশ শাসক।

১০ অক্টোবর ১৯০৫ চিফ সেক্রেটারি আর. ডবল্যু. কার্লাইল সব জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টরদের কাছে গোপন সার্কুলার পাঠালেন : বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের যোগদান কড়া হাতে দমন করতে হবে। অপরদিকে রাখিবন্ধন উৎসবের ডাক দিয়ে ১৬ অক্টোবর পথে নামলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়কে আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ করতে সে এক আবেগতাড়িত, কুশলী উদ্যোগ। কবির স্বদেশি গানে সকলে গলা মেলাল, তার সঙ্গে সমস্বরে বারবার ধ্বনি উঠল ‘বন্দে মাতরম্’। ওইদিনই নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও অসমের চিফ সেক্রেটারি পি. সি. লায়ন তাঁর নিজের এলাকায় কার্লাইল সার্কুলারের অনুরূপ এক সার্কুলার জারি করলেন; সঙ্গে যোগ করলেন বিদেশি দ্রব্য বয়কটে যারা পিকেটিং করবে ভবিষ্যতে তারা কোনও সরকারি চাকরি পাবে না। পিকেটিং করলে ছাত্রদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে

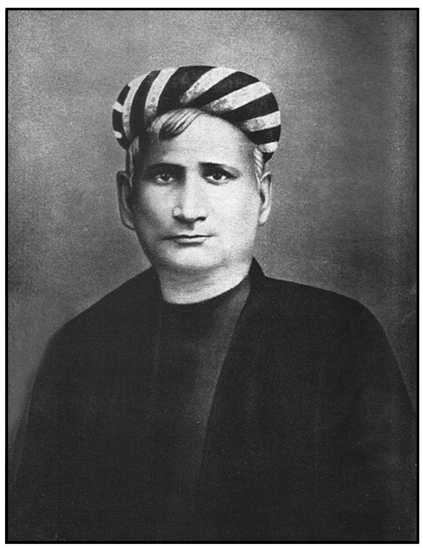

এই মর্মে ৩১ অক্টোবর ১৯০৫ নির্দেশ জারি করলেন রংপুরের ম্যাজিস্ট্রেট টি. এমারসন। আর সেদিনই সেখানের এক জনসভায় ছাত্রেরা দলে দলে নির্দ্বিধায় যোগ দিল, স্বদেশি গান গাইল, আর ‘বন্দে মাতরম্’ জয়ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত করল, কাঁপন ধরাল শাসকের আত্মবিশ্বাসে। ৮ নভেম্বর লায়ন ঢাকা বিভাগের কমিশনারকে এক সার্কুলার পাঠালেন : রাস্তায় বা প্রকাশ্য স্থানে ‘বন্দে মাতরম্’ ধ্বনি দেওয়া নিষিদ্ধ হল, নিষিদ্ধ হল দলবদ্ধভাবে ‘বন্দে মাতরম্’ গান করাও। পূর্ববঙ্গের অত্যাচারী ছোটলাট ফুলার সাহেব হুকুম জারি করলেন, কেউ প্রকাশ্য স্থানে ‘বন্দে মাতর্ম’ ধ্বনি তুললে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে পারে।

এত অল্পকালের মধ্যে এতগুলি দমনমূলক পদক্ষেপ নেওয়ায় বোঝাই যাচ্ছে, শাসক গানটির ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা উপলব্ধি করে কতটা অপ্রস্তুত এবং দিশেহারা। সেইসঙ্গে এটাও স্পষ্ট, গানটির ক্রমবর্ধমান ক্ষমতায় দেশবাসী, বিশেষ করে তার তরুণতর অংশ কতটা উদ্বুদ্ধ এবং বেপরোয়া।

ডিসেম্বর ১৯০৫ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসল বারাণসীতে। সভাপতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে। সেবার নরমপন্থী আর চরমপন্থীদের মধ্যে প্রকাশ্য মতভেদ। কিন্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা প্রতিনিধিদের মধ্যে সভায় ‘বন্দে মাতরম্’ গান

শোনার বিষয়ে কোনও মতভেদ নেই। ‘সাবধানপন্থী’ গোখলে জানেন, ইতোমধ্যে পূর্ববঙ্গের কিছু কিছু জায়গায় ‘বন্দে মাতরম্’ ধ্বনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু বেনারস তো পূর্ববঙ্গে নয়, প্রতিনিধিদের যুক্তিযুক্ত আগ্রহাতিশয্যে বাধ্য হয়ে গোখলে চিরকুট পাঠালেন সরলা দেবীর কাছে, ‘বন্দে মাতরম্’ গাইতে হবে। তার কিছুদিন আগেই রবীন্দ্রনাথ ভাগ্নি সরলাকে বলেছিলেন, ‘বন্দে মাতরম্’-এর ‘বাকি কথাগুলিতে তুই সুর বসা’—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ প্রথম যে-অংশটুকুতে আগে সুর দিয়েছিলেন তার বাকি অংশ। সরলা যে-সুর দেন রবীন্দ্রনাথ তাতে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এবার সভাপতির আহ্বানে ‘নানা ভাষা, নানা মত’ প্রতিনিধিদের সামনে সরলা সেই গান পরিবেশন করলেন। সকল ভারতবাসীর কাছে প্রাসঙ্গিক করার জন্য গাওয়ার মাঝে নিপুণ সম্পাদনাও করলেন গানটিতে, ‘সপ্তকোটী’র বদলে উচ্চারণ করলেন ‘ত্রিংশকোটি’। পরিণত বয়সে সরলা স্মৃতিচারণ করেছেন, তাঁর পরিবেশিত ‘বন্দে মাতরম্’ শুনে শ্রোতৃমণ্ডলীর ‘প্রাণ আলোড়িত হয়ে উঠল। ভারতের প্রান্ত প্রান্ত থেকে সমাসীন দেশভক্তদের মধ্যে আজও যাঁরা জীবিত আছেন—সেদিনকার গান ভুলতে পারেননি।’

মাস কয়েক পর ১৪ এপ্রিল ১৯০৬ কংগ্রেসের বার্ষিক প্রাদেশিক সম্মেলন বসল বরিশালে। তার বিপুল প্রস্তুতিপর্বে সাধারণ মানুষের সোৎসাহ অংশগ্রহণ শাসক শ্রেণিকে দুশ্চিন্তায় ফেলল। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট এমারসন সভা ও শোভাযাত্রায় ‘বন্দে মাতরম্’ গান গাওয়া বা ধ্বনি দেওয়া নিষিদ্ধ করলেন। এ-ধ্বনি যেন তাঁদের কাছে ‘ওয়ার ক্রাই’।

সম্মেলনের দিন বেলা দেড়টায় পূর্ব ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রতিনিধিদের বিশাল শোভাযাত্রা ‘রাজা সাহেবের বাংলো’ থেকে সভাক্ষেত্রে রওনা দিল। পুরোভাগে এবারের সম্মেলনের সভাপতি ব্যারিস্টার আবদুল রসুল চলেছেন তাঁর ইংরেজ পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে। তাঁর পেছনে পদব্রজে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। তার পেছনে বিপুল সংখ্যক জনতা। স্বেচ্ছাসেবকদের ‘বন্দে মাতরম্’ ব্যাজ দেখে এবং মুহুর্মুহু ‘বন্দে মাতরম্’ স্লোগান শুনে ত্রস্ত পুলিশবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল শোভাযাত্রায়, বেপরোয়া লাঠি চালাতে লাগল নিরস্ত্র দেশপ্রেমীদের ওপর। প্রতিটি প্রহারের উত্তরে উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনি উঠল ‘বন্দে মাতরম্’। রক্তের স্রোত বইল রাজপথে। তবু সে-ধ্বনি থামানো গেল না। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে বিশিষ্ট স্বদেশি নেতা মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার কিশোর পুত্র চিত্তরঞ্জনের কথা। তাকে পুলিশ পুকুরের জলে ফেলে লাঠিপেটা করে। যতবার লাঠি মাথায় পড়েছে, সে প্রত্যুত্তরে উচ্চারণ করেছে ‘বন্দে মাতরম্’। দিশেহারা জেলা প্রশাসন শেষপর্যন্ত সভাস্থলে ফৌজদারি দণ্ডবিধির একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ঘোষণা করলেন, এই অধিবেশন বন্ধ করা হল।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই আদেশনামা ঘৃতাহুতি দিল বিদ্রোহের পবিত্র হোমানলে। বরিশাল থেকে সেই আগুন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল গোটা ভারতবর্ষে। নানা ভাষাভাষী লক্ষ লক্ষ চিত্তরঞ্জন দেশমাতার নামে নিজেকে উৎসর্গ করল।

গোটা দেশে এই সংগ্রামকে ছড়িয়ে দেওয়ার

জন্য দেশীয় সংবাদপত্রগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিল। এর মধ্যে অগ্রণী বিপিনচন্দ্র পাল সম্পাদিত ইংরেজি দৈনিক 'বন্দে মাতরম্'। পদবন্ধটি যেন স্বদেশিয়ানার সমার্থক হয়ে উঠল। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সেলুলার জেলের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জানিয়েছেন, স্বদেশি কয়েদিদের সেখানে 'বন্দেমাতরম্ কয়েদি' নামেও অভিহিত করা হত। ভগিনী নিবেদিতা স্বাধীন ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকার যে-নকশা তৈরি করেছিলেন, তার ওপর বড় করে লেখা ছিল 'বন্দে মাতরম্'। নিবেদিতার বিশেষ অনুরাগী তামিল কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতী ১৯০৫ সালেই 'বন্দে মাতরম্' অনুবাদ করলেন। বিশিষ্ট প্রকাশক জি. এ. নটেশন এই অনুবাদ-পদ্যটি পনেরো হাজার কপি ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। 'বন্দে মাতরম্' একে একে অনূদিত হয় হিন্দি (১৯০৬), তেলেগু (১৯০৭), তামিল (১৯০৮) এবং মালয়ালম (১৯০৯) ভাষায়। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের আগেই অনুবাদ হয়েছিল মারাঠি (১৮৯৭), কানাড়া (১৮৯৭), গুজরাতি (১৯০১) ভাষায়।

দক্ষিণ ভারতে তুতিকোরিন এবং কলম্বোর মধ্যে দীর্ঘকাল যাবৎ যাত্রীবাহী স্টিমার চালাত এক ব্রিটিশ কোম্পানি। শাসক-পোষিত একচেটিয়া বাণিজ্যের সুযোগ নিয়ে তারা চড়া ভাড়া ধার্য করত। আগস্ট ১৯০৬ সেখানে 'স্বদেশি স্টিম ন্যাভিগেশন কোম্পানি' তৈরি হল ও আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ কোম্পানি তার ব্যবসা গোটাতে বাধ্য হল। এই লড়াইয়ে আন্দোলনকারীদের কণ্ঠে আগাগোড়া ছিল 'বন্দে মাতরম্'। তিনেভেলিতে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দেওয়ায় ম্যাজিস্ট্রেট একটি পনেরো বছরের বালককে বেত্রাঘাতের নির্দেশ দিলে এই অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে হরতাল ডাকা হল। তার সমর্থনে তুতিকোরিন থেকে দলে দলে ছাত্র-যুবা এল তিনেভেলিতে। কণ্ঠে তাদের নিশ্চয় 'বন্দে মাতরম্'।

আন্দোলন ছড়িয়ে গেল পশ্চিম ভারতে। রাওয়ালপিণ্ডি ও লাহোরে স্বদেশি সভা ও শোভাযাত্রায় বারবার শোনা যেত 'বন্দে মাতরম্'। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে পাঞ্জাব থেকে লালা লাজপৎ রায় যে-উর্দু সংবাদপত্র প্রকাশ করলেন তার নাম 'বন্দে মাতরম্'। প্রায় একই সময়ে পুনা থেকে এই একই নামে এক সংবাদপত্র প্রকাশ পেতে শুরু করে। নাগপুরের নীলসিটি স্কুলের ছাত্ররা এক স্বদেশি সভায় 'বন্দে মাতরম্' গান গাওয়ায় উঁচু দুই শ্রেণির সকল ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়; আন্দোলনের চাপে মাস দুই পর অধ্যক্ষ এই নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন। ২৯ জুন ১৯০৮ লোকমান্য তিলকের বিচারের সময় আদালত চত্বরে বিরাট জনতা এত ঘন ঘন 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিতে থাকে যে তাদের ছত্রভঙ্গ করতে বিকেলবেলা অশ্বারোহী বাহিনীর শরণাপন্ন হতে হয়। ওই বছর সেপ্টেম্বরে গণপতি পূজায় মণ্ডপে মণ্ডপে তিলকের ফটো টাঙানো হয়; 'বন্দে মাতরম্' এবং 'ভারতমাতা কি জয়' ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত থাকে। হায়দ্রাবাদ, কর্ণাটকেও 'বন্দে মাতরম্' বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

ভারতীয় ছাত্রদের মাধ্যমে এই ধ্বনি পৌঁছে গিয়েছিল ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সেও। গদর আন্দোলনের নেতারা যখন কানাডা বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মিলিত হতেন, তাঁরা 'বন্দে মাতরম্' বলেই পরস্পরকে অভিবাদন জানাতেন। নিবেদিতা পরিকল্পিত স্বাধীন ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকার মধ্যস্থলে লেখা ছিল 'বন্দে মাতরম্';

মাদাম কামার নেতৃত্বে প্যারিসে ভারতের যে-পতাকা প্রস্তুত হল তার বুকেও দেবনাগরী হরফে লেখা সেই একই মন্ত্র।

'টাইমস' পত্রিকা একবার লিখেছিল, ভারতবাসী 'বন্দে মাতরম্'-কে তাদের কণ্ঠের বুলি করে নিয়েছে।... এই মাতৃমন্ত্রকে পুলিশি শাসনে কি স্তব্ধ করা যাবে? কোটি কোটি ভারতবাসীর কণ্ঠ মূক করে দেওয়ার মতো কত পুলিশ আছে ব্রিটিশ সরকারের?

ব্রিটিশ সরকারও অচিরেই সেকথা বুঝতে পারছিল; বুঝতে পারছিল, বঙ্গ বিভাজনের সিদ্ধান্ত থেকে আপাতত অন্তত তাদের পিছু হটতে হবে। ভারত ভ্রমণে এসে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ১২ ডিসেম্বর ১৯১১ দিল্লির দরবারে ঘোষণা করলেন, বাংলা ভাগের সিদ্ধান্ত রদ করা হল। জয় হল বাঙালির, জয় হল ভারতবাসীর, জয় হল 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের।

প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্ম

এই ঘোষণার সপ্তাহ দুই পর, ২৬-২৮ ডিসেম্বর ১৯১১, কলকাতায় নির্ধারিত ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ছাব্বিশতম অধিবেশন। দল তখন নরমপন্থীদের নিয়ন্ত্রণে। তাঁরা স্থির করলেন বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কংগ্রেস মণ্ডপ থেকে রাজদম্পতিকে সম্বর্ধনা জানানো হবে। এটি প্রকারান্তরে ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ। তাই দলের এক অংশ এই উদ্যোগের বিরোধিতা করলেও সংখ্যালঘিষ্ঠতার কারণে তাঁদের আপত্তি গুরুত্ব পেল না।

এই রাজসম্বর্ধনার অনুষ্ঠানে এক প্রশস্তি-সংগীত রচনার অনুরোধ এল রবীন্দ্রনাথের কাছে। অনুরোধ পাঠানো হল কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা দেবীর স্বামী, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী আশুতোষ চৌধুরীর মাধ্যমে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনে কবির যে-অবস্থান তাতে তাঁর পক্ষে রাজপদলেহী গান রচনা যে কতটা অসমীচীন, তা আয়োজকদের মাথায় আসেনি।

সৌজন্যবোধে অটল রবীন্দ্রনাথ স্নেহাস্পদ আত্মীয়ের অনুরোধ অস্বীকার করলেন না। রাজার প্রসঙ্গ অনুল্লিখিত রেখে তিনি এক গান রচনা করলেন যেখানে দেশের ভাগ্যবিধাতার জয় ঘোষণা করা হল। রচিত হল, 'জনগণমন-অধিনায়ক'।

জাতীয় সংগীত নির্বাচনের কালে এই গান রচনার প্রেক্ষাপটটি নিয়ে অনেক বিতর্ক দানা বেঁধেছিল, অপদস্থ করার চেষ্টা হয়েছিল স্বয়ং বিশ্বকবিকে। তাই এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যটি জেনে রাখা জরুরি। ২০ নভেম্বর ১৯৩৭ তিনি পুলিনবিহারী সেনকে লিখেছিলেন, ''সে বৎসর [১৯১১] ভারতসম্রাটের আগমনের আয়োজন চলছিল। রাজ-সরকারে প্রতিষ্ঠাবান আমার কোনো বন্ধু সম্রাটের জয়গান রচনার জন্যে আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শুনে বিস্মিত হয়েছিলুম, সেই বিস্ময়ের সঙ্গে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় ভারতভাগ্যবিধাতার জয় ঘোষণা করেছি, পতনঅভ্যুদয়বন্ধুর পন্থায় যুগযুগধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথি, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথপরিচায়ক—সেই যুগ যুগান্তরের মানবভাগ্যরথচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বা কোনো জর্জই কোনো ক্রমেই হতে পারেন না সে কথা রাজভক্ত বন্ধুও অনুভব করেছিলেন।''

এই চিঠি লেখার বছর দেড়েক পর সুধারানি দেবীকে কবি এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, ''শাশ্বত মানব-ইতিহাসের যুগযুগধাবিত পথিকদের চিরসারথি বলে আমি চতুর্থ বা পঞ্চম জর্জের স্তব করতে পারি, এরকম অপরিমিত মূঢ়তা আমার সম্বন্ধে যাঁরা সন্দেহ করতে পারেন তাঁদের উত্তর দেওয়া আত্মাবমাননা।''

'বন্দে মাতরম্' সংক্রান্ত কালানুক্রমিক বিবরণীতে ফিরে আসার আগে একটা বিষয় খেয়াল করি : বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা নিশ্চয় 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের পক্ষে এক বিজয়ক্ষণ; সেইসঙ্গে এটিও ঠিক, এই বিশেষ ক্ষণকে উপলক্ষ্য করেই স্বাধীন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মান লাভের ক্ষেত্রে এই গানের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী 'জনগণমন-অধিনায়ক' জন্ম নিল।

'বন্দে মাতরম্' চাই না

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তুঙ্গে ব্রিটিশ-বিরোধী ধ্বনি হিসেবে 'বন্দে মাতরম্', সেই ১৯০৫-১৯০৮ পর্বেই অবিভক্ত বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সংগীত সম্পর্কে বিকর্ষণ দানা বাঁধছিল। তাঁদের আপত্তির প্রধান কারণ, 'বন্দে মাতরম্' গান পৌত্তলিকতার পরিপোষক। বিশেষত 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী/ কমলা কমলদলবিহারিণী/ বাণী বিদ্যাদায়িনী'—অংশে হিন্দুদেবীদের নাম উল্লেখিত।

প্রকৃতপক্ষে দেশমাতাকেই এই গানে মা হিসেবে বন্দনা করা হচ্ছে, কোনও ধর্মীয় দেবীকে নয়—সেকথা অনেকেই নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা 'হরিজন' পত্রিকার ১ জুলাই ১৯৩৯ সংখ্যায় মহাত্মা গান্ধির কথা উদ্ধৃতি করি, ''এই গানের সূত্র কী আর কোথায়, কিভাবে এটি রচিত হয়েছিল সেই তথ্য অবান্তর। বঙ্গভঙ্গের সময় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এই গান বাংলায় এক শক্তিশালী battle cry হয়ে উঠেছিল। এটি ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এক ধ্বনি। বালক বয়সে যখন আমি 'আনন্দমঠ' সম্পর্কে কিছুই জানতাম না, জানতাম না এর অমর স্রষ্টা বঙ্কিম সম্পর্কেও, তখনই 'বন্দে মাতরম্' had gripped me...। আমার কখনও মনে হয়নি, এটি একটি হিন্দুধর্মীয় সংগীত, বা কেবলমাত্র হিন্দুদের জন্য এই গান।''

কিন্তু এমন যুক্তিকে সবাই গ্রহণযোগ্য মনে করলেন না। তাই ২৮ অক্টোবর ১৯৩৭ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কলকাতা থেকে ঘোষণা করলেন, জাতীয় সভাসমিতিতে 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া হলে সেই গানের শুধু প্রথম দুটি কলি গাওয়া হবে। গানের অঙ্গচ্ছেদের সেই ঐতিহাসিক প্রস্তাবের মুসাবিদা করেছিলেন সম্ভবত জওহরলাল নেহরু। সেখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি জানানো হয়, এই গান 'living and inseparable part of our national movement' এবং 'There is nothing in the [selected] stanza to which any one can take exception.' কিন্তু সেই আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে মুসলিম লীগ তাদের আপত্তিতে অনড় থাকল। অপরদিকে অঙ্গচ্ছেদের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করল হিন্দু মহাসভাও। মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাই তার প্রস্তাবে আর একটি অংশ যোগ করতে বাধ্য হল : জাতীয় সভাসমিতিতে এই গানের পরিবর্তে অন্য কোনও সর্বজনগ্রাহ্য গান পরিবেশন করার পূর্ণ স্বাধীনতা উদ্যোক্তাদের থাকবে।

ভারতীয় জনগণের মানস-সিংহাসনে 'বন্দে

মাতরম্'-এর একচ্ছত্র আধিপত্য সরাসরি ক্ষুণ্ণ করা হল।

নিরাবেগ দূরত্বে দাঁড়িয়ে আমরা 'বন্দে মাতরম্'-এর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলিকে বিচার করার চেষ্টা করি।

এক, এই গানে মুসলমান বিদ্বেষ দূরস্থান, হিন্দু-মুসলমান বা কোনও ধর্মমতেরই কোনও উল্লেখ নেই। আদি গানটিতে সপ্তকোটি কণ্ঠের উল্লেখ—সেইসময় সমগ্র বাংলা প্রদেশের লোকসংখ্যা ছিল আনুমানিক সাত কোটি; পরে সমগ্র ভারতবর্ষের উপযোগী করে তোলার জন্য 'ত্রিংশ কোটি' করা হল গোটা দেশের তদানীন্তন জনসংখ্যার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে। এই সাত বা ত্রিশ কোটি মানুষের মধ্যে তাই হিন্দু, মুসলিম ইত্যাদি সব ধর্মমতাবলম্বীই অন্তর্ভুক্ত।

দুই, 'আনন্দমঠ' পাঠে আপাতভাবে মুসলিম বিদ্বেষ যদি কেউ খুঁজেও পান, সেই উপন্যাস রচনার অনেক আগে রচিত 'বন্দে মাতরম্'-কে নিশ্চয় সেই দোষে সংক্রামিত করা যায় না।

তিন, গানটিতে পৌত্তলিক বিশ্বাস স্পষ্ট—এই অভিযোগের প্রসঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য উদ্ধৃত করি। বুদ্ধদেব বসুকে তিনি লিখেছিলেন, "তুমি কি বলতে চাও, 'ত্বং হি দুর্গা', 'কমলা কমলদলবিহারিণী', 'বাণী বিদ্যাদায়িনী' ইত্যাদি হিন্দু দেবীনাম-ধারিণীদের স্তব, যাদের 'প্রতিমা পূজি মন্দিরে মন্দিরে', সার্বজাতিক গানে মুসলমানদের গলাধঃকরণ করাতেই হবে। হিন্দুর পক্ষে ওকালতি হচ্ছে এগুলি আইডিয়া মাত্র। কিন্তু যাদের ধর্মে প্রতিমাপূজা নিষিদ্ধ তাদের কাছে আইডিয়ার দোহাই দেবার কোনো অর্থই নেই।'' রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধর্মমতেও 'প্রতিমাপূজা নিষিদ্ধ' এবং সেই বিশ্বাস দ্বারা তিনি প্রভাবিত, বিশ্বকবির মতো মুক্তমনার বিরুদ্ধে এমন সংশয় প্রকাশ নিশ্চয় অন্যায়। আমরা শুধু সমসাময়িক অপর এক মননশীল ব্রাহ্ম রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ভিন্ন মত এর পাশে উল্লেখ করি, ''গানটি বাঙালী হিন্দুর রচিত। এইজন্য ইহাতে পৌরাণিক কোন কোন দেবতার নাম ও স্বরূপ ব্যবহার করিয়া কবি নিজের ভাব ও চিন্তা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহাতে গানটি পৌত্তলিক গান হইয়া যায় নাই।''

ধর্মীয় আনুগত্যের ঊর্ধ্বে উঠে বিশিষ্ট চিন্তক রেজাউল করিম তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ' গ্রন্থে কী সাবধানবাণী শুনিয়েছিলেন তার অংশ : ''[প্রকাশের] বহু বর্ষ পরে হঠাৎ আজ 'আনন্দমঠে'র বিরুদ্ধে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা মুসলমানের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার উদ্দেশ্যে নহে;... তাহার মূল কারণ—মুসলমান যাহাতে মুক্তি-আন্দোলনে যোগ দিতে না পারে, তাহার জন্য কতকগুলি ছল বাহির করিবার [ব্রিটিশ সরকারের] দুরভিসন্ধি।... কিন্তু ইহাকে উপলক্ষ করিয়া মুসলমানের মধ্যে যে ধর্মান্ধতা প্রশ্রয় পাইতেছে, তাহাতে সমাজের বিস্তর ক্ষতি হইবে, এবং তাহার মানসিকতা কলুষিত হইয়া পড়িবে।''

বাস্তবে হলও তাই। 'বন্দে মাতরম্' তার পবিত্র আভিজাত্য হারিয়ে এক সম্প্রদায়ের কুক্ষিগত উল্লাসধ্বনিতে পরিণত হল। ইতিহাস সাক্ষী, ১৯২১ সাল থেকে যখন হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে সংগ্রাম করেছে তখন এটিই জয়ধ্বনি হিসেবে উচ্চারিত হয়েছে; কিন্তু তারা বিবদমান দুই শিবিরে বিভাজিত হয়ে যাওয়ার পর এক পক্ষের ধ্বনি যখন 'বন্দে মাতরম্' অপর পক্ষের তখন 'আল্লা-হো-আকবর'; দুই পক্ষের ভ্রাতৃঘাতী

হননের দিনে-রাতেও দুই শিবির থেকে এমনই দুই ধ্বনি উঠত।

তবু 'বন্দে মাতরম্'

ধর্মের ভিত্তিতে খণ্ডিত স্বাধীন ভারতবর্ষ যখন ১৯৪৭ সালে নিউ ইয়র্কে জাতি সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে জাতীয় সংগীতের সুর ব্যান্ডে বাজানোর অধিকার অর্জন করল, তখন তার প্রতিনিধিরা শোনালেন 'জনগণমন' গানের সুর। বিতর্কের উত্তরে বলা হয়েছিল 'বন্দে মাতরম্' গানের সুরের কোনও রেকর্ড তখন পাওয়া যায়নি, তাছাড়া এই সুর বিদেশে অর্কেস্ট্রাতে সঠিকভাবে তোলা সহজসাধ্য নয়। 'জনগণমন'-র সুর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি এবং পরে বিশ্বের অনেক সংগীতবিশেষজ্ঞ দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত হয়। তারপর থেকে সামরিক কুচকাওয়াজ এবং সরকারি অনুষ্ঠানে 'জনগণমন'-র সুরই বাজানো হতে থাকে।

তাহলে আমাদের স্বাধীন দেশের জাতীয় সংগীত হচ্ছে কোনটি? বিষয়টি নিয়ে নানা স্তরে আলোচনা এবং বিতর্ক চলতে থাকল। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব বর্তাল গণপরিষদের ওপর। প্রসঙ্গটি গণপরিষদের আলোচ্য সূচিতে ছিলও। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এটি নিয়ে আদৌ কোনও আলোচনা হল না!

শেষপর্যন্ত ২৪ জানুয়ারি ১৯৫০ গণপরিষদের অধিবেশনে সভাপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিবৃতি দিলেন, "...Jana Gana Mana is the National Anthem of India...; and the song Vande Mataram which has played a historic part in the struggle for Indian freedom, shall be honoured equally with Jana Gana Mana and shall have equal status with it." মাননীয় সদস্যদের হর্ষধ্বনি প্রমাণ করল, বিতর্কটির এর চেয়ে ভাল আর কোনও সমাধান হওয়া সম্ভব ছিল না।

এই ঘোষণায় খুব সামান্য হলেও 'জনগণমন' বাড়তি গুরুত্ব পেল ঠিকই, কিন্তু 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রকৃত স্বীকৃতি দেশপ্রেমিকের উদ্দীপ্ত হৃদয়ে, সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে। 'কেমব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া'-য় বলা হয়েছে, "The greatest and most enduring gift of the Swadeshi movement was Bande Mataram, the uncrowned national anthem."

সত্যি, রাষ্ট্রীয় মুকুট আসুক আর না আসুক, 'বন্দে মাতরম্' এখনও জাতীয় স্তরে প্রাণের সংগীত। যুগে যুগে কত শিল্পী তাকে আপনমনের মাধুরী মিশিয়ে অভিষিক্ত করেছেন, পরিবেশন করেছেন, নিজেদের সুরের অর্ঘ্য অর্পণ করেছেন। যদুভট্ট, রবীন্দ্রনাথ, সরলা দেবীর পরেও আরও কতজন সুর দিয়েছেন 'বন্দে মাতরম্' গানে : ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, সুব্বুলক্ষ্মী, দিলীপকুমার, তিমিরবরণ থেকে গত শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে এ. আর. রহমান। বি.বি.সি.-র সমীক্ষা গানটির অমরত্বকেই প্রমাণ করে। ✠

সহায়ক গ্রন্থ

১। জগদীশ ভট্টাচার্য, *বন্দে মাতরম্*, কবি ও কবিতা প্রকাশন: কলকাতা, ১৯৭৮

২। Sabyasachi Bhattacharya, *Vande Mataram: The Biography of a Song*, Penguin Book, 2003

৩। অমলেশ ভট্টাচার্য, *বন্দে মাতরম্*, সূত্রধর, ২০১৬